সাইবার অপরাধ দমাতে তৎপর পুলিশ, অভিভাবকেরও দায়িত্ব রয়েছে

ফেসবুক, ইমোসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধ বাড়ছে। সামাজিক বিভিন্ন শালিসের বিষয়বস্তুই হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে নিয়ে। মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য, উপাত্ত, আপত্তিকর কনটেন্ট প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে এ ধরণের অপরাধ করছে এক শ্রেণীর অপরাধীরা।

দ্রুত এ ধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে। একই সঙ্গে অভিভাবকদের এ বিষয়টি গুরত্ব সহকারে নিয়ে কিশোর সন্তানদের নজরে রাখতে হবে।

সাইবার অপরাধের সূত্র ধরে সম্প্রতি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীকে আটক করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। এরা আন্তর্জাতিক ডার্কসাইটের নিবন্ধনকৃত সদস্য। তারা কিশোরী মেয়েদের ফুসলিয়ে তাদের কাছে থেকে পর্ণোগ্রাফির কনটেন্ট সংগ্রহ করে ওই ডার্কসাইটগুলোতে দেয়। না দিলে তাদের পরিচয় ফাঁস করে দেওয়া হবে হুমকি দেওয়া হয় সাইটগুলো। যে ভয়ে তারা এ ধরণের অপরাধ গুলো করতো বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে স্বীকরোক্তী দিয়েছে।

বিশেষ করে মানসিকভাবে বিকৃত শ্রেণীর অপরাধীরা এই ধরণের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে বেছে নিয়ে তার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যকে বিব্রত করে। এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, সামাজিক ভাবেও বর্জন করতে হবে। পাশাপাশি এ ধরণের অপরাধে যাতে অন্যরা না জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। করোনা কালে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় কিশোর কিশোরীরা ইন্টারনেটের প্রতি ঝুকে পড়েছে। তাদের নজরে রাখার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। আর এ কাজটি সবার আগে করতে হবে অভিভাবকদের।

সাইবার অপরাধ দমনে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ রাজধানীতে একটি

সাইবার থানা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছে। পরবর্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরণের সাইবার থানা প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সাইবার থানায় যে সকল কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পাবেন তাদের সকলেই সাইবার অপরাধ নিয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফলে ভুক্তভোগীরা সরাসরি সাইবার থানায় অভিযোগ করে দ্রুত সমস্যার সমাধান পাবেন।

এছাড়াও প্রতিটি থানাতে সাইবার থানার হট লিংক স্থাপন করতে হবে যাতে ভুক্তভোগীরা দ্রুত এ সমস্যার সমাধান পায় এবং হয়রানি থেকে বাঁচতে পারে।

শান্ত মেহেরপুর কে শান্তই দেখতে চাই

মেহেরপুর থানার অদূরে ফারুক নামের এক সরকারি কর্মচারীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে কি কারণে বা কারা এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে পুলিশ জানতে পারেনি। জানতে পারেনি তার পরিবার বা স্থানীয়রা।

পুলিশ কয়েকটি বিষয়কে সামনে নিয়ে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ খুজার চেষ্টা করছে। তবে ২৪ ঘন্টাতেও তেমন কোন আশাব্যঞ্জক খবর পাওয়া যায়নি। যথারিতি দাফন শেষে ফারুকের স্ত্রী বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন। যেহেতু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোন কিছুই কেউ জানে না সে হিসেবে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে ফারুকের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। যদিও মোবাইল ফোনটি ঘাতকরা নাকি ভেঙে দিয়েছে। তবে পুলিশের তদন্তে মোবাইল ফোনটি অনেক আশার খবর দেবে এটাই ধারণা করা হচ্ছে।

তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে সাধারণ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে তা হলো শহরের মত একটি স্থানে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না।
তবে কি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে? শান্ত মেহেরপুর কি অশান্ত হতে চলেছে? সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি হচ্ছে।

দু’একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটলেই আইন শৃঙ্খলা অবনতি বলা যাই ই বা কিভাবে। আবার খুব বেশি ভাল অবস্থা সেটিও বলা যাচ্ছে না। গত মাসের ২ তারিখে গাংনীর হাড়াভাঙ্গায় মসজিদের এক মুয়াজ্জিনকে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। দুই মাসে দুই খুন। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে আরো সক্রিয় হতে হবে। শান্ত মেহেরপুর যেন কোনভাবেই অশান্ত না হয়ে যায় সেদিকে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে।

সাংবাদিক, প্রশিক্ষণ ও বাস্তবতা!

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের মধ্যে গ্রুপিং, মতবিরোধ আছে, থাকতেই পারে। সেই মতবিরোধ সাংবাদিকতার সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগানোটাও অপসাংবাদিকতার একটি রুপ।

মতের বিরুদ্ধে গেলেই যে সহকর্মীর বিরুদ্ধে যেতে হবে এটা হয়তো কাম্য নয়। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে এটি অনেক বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সংবাদকে কেন্দ্র করেও সহকর্মী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেতেও আজকাল খুব বেশি কার্পণ্য দেখাচ্ছেন না।

এছাড়াও সাংবাদিকতার মধ্যে যখন অতিবেশি রাজনীতিকরণ ঢুকে পড়ে তখন আর সাংবাদিকতা থাকেনা সেটি দলবাজি হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সবসময়ই সাংবাদিকদের পক্ষে নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা সফল হচ্ছেন তাদের কাঙ্খিত প্রত্যাশা পূরণে। যখন যে সাংবাদিককে যেভাবে চাচ্ছেন, সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে ফেলছেন। একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে এটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জার এবং অপমানজনক।

ঠিক তেমনি সেই ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সুরক্ষা করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন আমার সহকর্মীরা। কেউ বা পদের সুরক্ষা নিয়ে আবার কেউ বা অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিয়ে। যাহোক এ সংস্কৃতি থেকে বের হতে না পারলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারার জন্য অন্য কাউকে লাগবে না।

মতবিরোধের সূত্র ধরেই তিন দিন ব্যাপী মেহেরপুরে সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী রিপোটিং প্রশিক্ষণে স্থান পাননি দেশের প্রথম সারি ও মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকরা।

যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, বাসস, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রতিদিনের সংবাদ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, ডেইলি স্টার, আমাদের অর্থনীতি, বণিক বার্তা, বিজয় টিভি, বাংলা টিভি, মোহনা টিভি, সময়ের আলো, জবাবদিহিরমত গণমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের নেওয়া হয়নি প্রশিক্ষণে। মেহেরপুরবাসী ও মেহেরপুরের সাংবাদিকদের লজ্জার ইতিহাস থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেওয়া মেহেরপুরের একমাত্র দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকেও প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোন ধরণের আমন্ত্রণ বা অবগত করানো হয়নি।

তবে প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিউট (পিআইবি) যথাযথ গুরত্ব না দিয়ে কথিত একটি তালিকা ধরেই প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কথিত বলার পেছনে কারণ হলো প্রেসক্লাবের পিয়ন পদে চাকরি করা ব্যক্তিটি, সাংবাদিক থেকে ইস্তফা দেওয়া সাংবাদিক, পত্রিকা বা টেলিভিশন কিছুই নেই এমন জনকেও এই প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণের এই যায়গা টিকে কি প্রশ্নের বাইরে রাখা যেত না? “যাদের চোখে, সমাজ দেখে,” তাদের অন্তত এ ধরণের কাজগুলো করার আগে দুটি বার ভেবে দেখার জন্য বিনয়ী আহবান জানাচ্ছি।

কিশোর সন্তানদের নজরে রাখুন

আমাদের সমাজে মায়ের পরে একটি মানুষকে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান মনে করা হয়, তিনি হলেন ফুফু অর্থাৎ বাবার বোনকে। ফুফুর মত করে নিকট আত্মিয়দের মধ্যে আর কেউ বেশি ভালবাসে না। পরিবার, সমাজ ও মুরব্বীদের সাথে বিভিন্ন সময় আলাপকালে এ ধরণের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

তবে আমার এ লেখা পড়ে অনেকেই দ্বিমত বা দ্বিখণ্ডিত মতামত তুলে ধরতে পারেন। সে ধরণের কোন তর্কে আমি যাব না। হয়তো চাচি, খালা,

মামি, বোন অনেক সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই কথা তুলতে পারেন। তবে আমি তুলনা করছি মোটামোটি মানুষের সাথে বিভিন্ন সময় কথা বলার পর।

আমার এ লেখার মধ্যে ফুফু নামক শব্দটি টানার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর একটি সংবাদ শিরোনাম থেকে আমি চোখ সরাতে পারিনি। শিরোনাম টি ছিল “ভাবিকে শিক্ষা দিতে ভাতিজিকে হত্যা”। শিশুটিকে হত্যা করেছে তার আপন ফুফু। শুনে অবাক হওয়ার মত। তবে অবাক করার থেকে ভাবনার বিষয়টি হলো যে, ফুফু এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সে ফুফু হতে পারেনি। ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া একটি মেয়ে ভাইয়ের মেয়ের কাছে এখনো ফুফু হতে পারেনি। সে প্রতিপক্ষ বা প্রতিযোগী হয়েছে। হয়তো পারিবারিক নানা কারণে।

সংবাদে প্রকাশ হত্যাকারী মেয়েটি এবং মেয়েটির মায়ের সাথে নিস্পাপ ওই শিশুর মায়ের পারিবারিক দ্বন্দ¦। অর্থাৎ আমাদের সমাজে যেটি হয়ে থাকে। শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ¦। সেই দ্বন্দে¦ মাঝে ঘি ঢালে ননদ নামের ওই মেয়েটি। সেই দ্বন্দে¦র জের ধরে অবুঝ ওই কিশোরী ফুসলিয়ে শিশুটির সাথে খেলার ছলে ভুগিয়ে শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে সেটি প্রতিয়মান হয়। ভাবিকে শাস্তি দিতেই সে এমনটি করেছে বলে স্বীকারও করেছে।

আমার এ লেখাটির পেছনে একটি কারণ। ৮ম শ্রেণীর একটি কিশোরী বা টিএনএজার। এরা সাধারণত অস্থির। কোন কিছুই মেনে নিতে পারেনা। অস্থিরতার বশবর্তি হয়ে বড় ধরণের অপরাধও করতে দ্বিধাবোধ করেনা। অপরাধবোধ বিষয়টি হয়তো তার জ্ঞানের পরিধিকে কাভার করে না। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোতে মাঝে মাঝে এমন খবর পাওয়া যায়। কিশোররা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছে।

এসময়ে আমাদের উচিত আমাদের ভাই, বোন, সন্তান এমনকি প্রতিবেশী কিশোর-কিশোরীদের নজরে রাখার। তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করে তাদের অস্থিরতা কাটানোর সময় এসেছে। একটু সচেতন হলেই ওই সকল কিশোর-কিশোরীরাও জীবনের মূল্যবোধ খুঁজে পেতে পারে। আমরা সকলেই কি তাদের নজরে নিয়ে আসার একটু চেষ্টা করতে পারিনা। হয়তো আমাদের ছোট এই সচেতনতায় একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে ?

বন্ধুত্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সীমান্ত হত্যা বন্ধ জরুরি!

বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্যে সীমান্ত হত্যা থেমে নেই। গতকাল সোমবার ঢাকার বিজিবির প্রধান কার্যালয় পিলখানায় চারদিনের এ সম্মেলন শেষ হয়েছে। এর মধ্যে গত রবিবার চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার ঠাকুরপুর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে ওমিদুল ইসলাম (১৯) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। এর আগে বুধবার দিনাজপুরের বিরল সীমান্তে জাহাঙ্গীর আলমের লাশ পাওয়া যায়। এছাড়া এই মাসে বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে আরও তিন বাংলাদেশি নিহত হন।

প্রতিমাসেই এভাবে নির্মমভাবে বিএসএফ এর গুলিতে বা নির্যাতনে প্রাণ হারাতে হচ্ছে বাংলাদেশিদের। যদিও বিএসএফ এর দাবি সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, মাদকদ্রব্য প্রতিরোধে তারা এ গুলি চালায়।তারপরও শ্যূট-অন-সাইট নীতি বাতিল করে তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারকারী বা পাচারকারীদের ধরতে অহিংস উপায় ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে অনেক আগেই। তারপরও এখনোও বাস্তবে সে প্রতিশ্রুতির কার্যকর হয়নি।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে, ২০২০ সালের সাড়ে ৮মাসে সীমান্তে হত্যা হয়েছে ৩৯ বাংলাদেশীর। এর মধ্যে বিএসএফ এর গুলিতে মারা গেছে ৩২ জন। বাকিরা বিএসএফ সদস্যদের শারীরিক নির্যাতনের কারণে মারা গেছে।

২০১৯ সালে সীমান্তে ৪৩ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ জন এবং নির্যাতনে ছয় জন। আহত হয়েছেন ৪৮ জন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন। ২০১৮ সালে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। আর ২০১৭ সালে ২৪ জন।

আসকের তথ্য মতে, ২০০৯ সাল থেকে গতকাল পর্যন্ত সীমান্তে ৫২২ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে। আর ১৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বিএসএফ সদস্যদের শারীরিক নির্যাতনের পর। আসকের এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১৫ সালের পর থেকে মাঝের তিন বছর সীমান্ত হত্যা কমতে থাকলেও ২০১৯ সালে হঠাৎ তা বেড়ে যায়। এই ধারা এ বছরও অব্যাহত আছে।

২০১১ সালে একটি সেমিনারে হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের এশিয়া বিভাগের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক, ব্যাড এডামস, সীমান্তে হত্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “Routinely shooting poor, unarmed villagers is not how the world’s largest democracy should behave.”

একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ এ ধরণের আচরণ থেকে বের হয়ে অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি দিয়ে উদাহরণ সৃস্টি করতে পারে। তবেই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চলমান বন্ধুত্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটল থাকবে।

করোনা ক্রান্তিকালে নিম্মবিত্ত-মধ্যবিত্তদের ভরসা কি?

‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি’। সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘হে মহাজীবন’ কবিতার এই লাইনটি আজ নিম্ববিত্ত-মধ্যবিত্তের চিরচেনা রুপে পরিণত হয়েছে।

চাকরি হারানো, আয় কমে যাওয়া, দ্রব্যমূল্যর লাগামহীন বৃদ্ধিতে দিশেহারা বিশেষ করে নিম্মবিত্ত-মধ্যবিত্তরা। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ কমে গেলেও এই ক্রান্তিকালে হারিয়েছে তারা অনেক কিছুই। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছেই, কিন্তু আয় বাড়ছে না। আবার অনেকের আয় একেবারেই কমে গেছে। এই পরিস্থিতি যারা ভবিষ্যৎ ভাবনায় যা সঞ্চয় করেছিলেন সেটিও ভাঙতে হচ্ছে। সঞ্চয় ভেঙে নিত্য দিনের সাংসারিক চাহিদা মেটাতেও হিমশিম খাচ্ছেন।

বাংলাদেশে ট্রেড কর্পোরেশন-টিসিবির তথ্য অনুযায়ী, এক বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর মধ্যে চালের দাম বেড়েছে ৪৪ শতাংশ, পেঁয়াজের দাম এক মাসে বেড়েছে কয়েকগুণ। টিসিবি মনিটরিং করে ৫২টি পণ্য। তার মধ্যে ৩৫টি পণ্যরই দাম বেড়েছে এক মাসের মধ্যে। যা মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয়ের ওপর গুরতর প্রভাব ফেলেছ।

এর মধ্যে আছে এনজিও ও ব্যাংক ঋণের বোঝা। ব্যাংক গুলো করোনাকালে সরকারি নির্দেশ মেনে কিস্তি আদায় বন্ধ রাখলেও এনজিও গুলো চুপিসারে তাদের নিয়োজিত কর্মীবাহিনীদের দিয়ে প্রতিনিয়ত চাপ দিয়ে ঋণের কিস্তি আদায় করেছে। এ ধরণের সংবাদও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পেতে দেখা গেছে।

এ অবস্থায় নিম্মবিত্ত-মধ্যবিত্তরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় পড়েছেন। সন্তানদের লেখাপড়া করানো, নিজেদের সাংসারিক চাহিদা মেটানো দুস্কর হয়ে পড়বে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যর লাগাম টেনে না ধরলে পরিস্থিতি আরো ভয়ানকের দিকে যাচ্ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, বাজার মনিটরিংয়ে দায়িত্ব প্রাপ্তদের এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। বাজার মনিটরিং জোর দার করতে পারলে অন্তত অল্প আয়ের এসব মানুষগুলো তাদের সাংসারিক চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দূর করতে পারবে।

পারিবারিক সহিংসতা রোধে সকলকেই ভূমিকা রাখতে হবে

সামাজিক মূল্যেবোধের অবক্ষয়, একে অপরের সাথে মনোমালিন্য, পরিবারের প্রতি উভয়ের টানাপোড়েনের কারণে পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক সহিংসতার কারণে প্রতিনিয়ত হত্যা ও আত্মহত্যার মত মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটছে।

বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর গত ৯ মাসের একটি পরিসংখ্যানে তারা জানিয়েছে, গত ৯ মাসে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৩২ নারী। এর মধ্যে হত্যার শিকার হন ২৭৯ নারী এবং পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৭৪ নারী। যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন মোট ১৬৮ নারী। এর মধ্যে যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৭৩ জন। যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ৬৬ জনকে এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৭ জন নারী।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দীতে গরম পানি দিয়ে ঝলসিয়ে রুবিনা খাতুন নামের এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে । এ ঘটনায় গতকাল শনিবার গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে। চিকিৎসক ও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে হত্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে পরিস্কার হবে হত্যার বিষয়টি।

তবে হত্যা বা আত্মহত্যা যাই হোক না কেন পারিবারিক সহিংসতায় একটি জীবনের ইতি ঘটলো। যা কখনোই একটি সুষ্ঠ সমাজের কাম্য নয়। এভাবে দেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ঝরে যাচ্ছে কত প্রাণ। নির্যাতনের শিকার হয়ে ক্ষত বয়ে বেড়াতে হচ্ছে অসংখ্যা জনকে। শুধু যে নারীরাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাও কিন্তু নয়। কিছু ক্ষেত্রে পুরুষরা নির্যাতিত হচ্ছেন। তারা আত্মহত্যা করে জীবন দিয়ে দিচ্ছেন অথবা হত্যার শিকার হচ্ছেন।

সমাজের এই নষ্ট চিন্তা রোধে সকলকেই একযোগে কাজ করতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে। সামাজিক মূল্যেবোধ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে। না হলে অদূর ভবিষ্যৎ এ আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি অবলোকন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণগুলোও অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। গণজাগরণ গড়ে তুলে পারিবারিক সহিংসতা রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

জেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং জোরদার করতে হবে

নতুন করে আলুর দাম বৃদ্ধিসহ সবজির দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। গত দু’মাস ধরে এমন পরিস্থিতি সবজির বাজারগুলোতে। আলুর দাম কেজি প্রতি যত বৃদ্ধি পেয়েছে তা পূর্বের যে কোন রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ মৌসুমে একজন চাষির প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮ টাকা ৩২ পয়সা। উৎপাদন থেকে শুরু করে অন্যান্য খরচ ধরে এক কেজি আলু হিমাগার পর্যন্ত

সংরক্ষণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২১ টাকা । সেই সূত্র ধরে হিমাগার পর্যায়ে কেজি ২৩ টাকা, পাইকারি পর্যায়ে ২৫ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ৩০ টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। সে মোতাবেক বাজার মনিটংরিং করার জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত দু’দিন ধরে দেশের বিভিন্ন জেলায় বেশি দামে আলু বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হচ্ছে এবং তদারকি করা হচ্ছে। কিন্তু মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এখনো কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তবে মেহেরপুর প্রতিদিন এর একটি সংবাদে জানা যায়, জেলা প্রশাসক কৃষি বিপণন কর্মকর্তাকে তদারকির দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্ব দিয়েই কি এ মনিটরিং কাজ শেষ করবেন।

এদিকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, আলু যে দামে ক্রয় করতে হচ্ছে সেই হিসেবে বেশি দামে বিক্রয় করতে হচ্ছে। সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে আলু বিক্রি করতে হলে ব্যবসায়ীদেও লোকসানের মুখে পড়তে হবে। তাছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন নির্দেশনা আমরা এখনো পাইনি।

সবমিলিয়ে বাজার মনিটরিং, বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলোর সাথে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। একই সঙ্গে কৃষকরা সবজি বিক্রি করে যে টাকা পাচ্ছেন তার থেকে একজন ক্রেতা কিনছেন অনেক বেশি দামে। বাজারের কোন দোকানে নির্ধারিত মূল্য তালিকা টাঙানো নাই। বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না করলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসক মহোদয় নজরে নিয়ে জরুরি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা করি।

ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন শিশুর অন্ধত্ব দূরীকরণে আশার

প্রদীপ

শিশুর সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সরকারের বহুমূখী পরিকল্পনার একটি নজির ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন। একটা সময় ছিল যখন শিশুরা সন্ধ্যায় চোখে দেখতে পেত না। বিষয়টাকে মা-বাবা গুরুত্ব দিত না বা খেয়াল করত না। একপর্যায়ে জানতে পারলো তার শিশুকে সময়মতো চিকিৎসা করালে অন্ধত্বে ভুগতে হতো না।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর অনাকাঙ্খিত পরিণতি এড়ানোর কথা মাথায় রেখে সরকার শিশুদের জন্য ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন নামে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়। এই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের প্রথম উপসর্গ হলো রাতকানা। এ ধরনের রোগীরা মৃদু আলোতে কম দেখে, সময়মত চিকিৎসা না হলে অন্ধ হয়ে যায়। এসব ছাড়াও ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, হাম, ডায়রিয়াসহ নানা কারণে মৃত্যুহার বেশি হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বছরে দু’বার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন হয়ে থাকে। এতে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সি সবশিশুকে একটি নীল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সি সব শিশুকে একটি করে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। নীল রঙের ক্যাপসুলের মাত্রা ১ লক্ষ আইইউ (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) এবং লাল রঙের মাত্রা ২ লক্ষ আইইউ।

(৪-১৭) অক্টোবর “জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন”। টীকাদান ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের ৬ মাস থেকে ১ বছরের কম বয়সি প্রায় ২৭ লক্ষ শিশুকে নীল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল এবং ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সি প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ শিশুকে লাল রঙের ১টি করে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। শিশু ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল পাবে। সরকারের লক্ষ্য হলো ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সি শিশুদের মাঝে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের প্রাদুর্ভাব এক শতাংশর নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়া এসব শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা। ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন এর অর্থ হলো শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো ছাড়াও এই দিনে মায়েদের মাঝে স্বাস্থ্য বার্তাসমূহ প্রচার করা। যেহেতু ৬ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ জাতীয় খাবার খাওয়ানো সবক্ষেত্রে নিশ্চিতকরা সম্ভব

হয় না, তাই সম্পূরক ভিটামিন হিসেবে এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়ে থাকে। মায়েদের জানা দরকার ভিটামিন ‘এ’ শরীরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা প্রয়োজন হয় অল্প পরিমাণে। এটা শুধু শিশুদের নয় বড়োদেরও প্রয়োজন। প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার স্থায়ী ইপি আই টিকাদান কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভিটামিন- ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। স্বাস্থ্যকর্মী প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার এবং স্বাস্থ্যসেবীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার।

ভিটামিন ‘এ’ মানবদেহের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান। প্রাণিজ উৎস হিসেবে কলিজা, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে মাছের তেলে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে সতেজ পাতাবহুল সবজি যেমন- পালং ও মেথিশাক, বাঁধাকপি এবং রঙিন সবজি যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেঁপে থেকেও আমরা ভিটামিন ‘এ’ পেয়ে থাকি।

সরকার বাস স্ট্যান্ড রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, বিমানবন্দরে, ফেরি ঘাট, ব্রিজ টোল প্লাজা এবং খেয়া ঘাটগুলোতে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। কর্মসূচির আওতায় ১২টি জেলার ৪২টি উপজেলায় ২৪০ ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুদের খুঁজে ক্যাম্পেইনের পরের চার দিন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। এছাড়াও ক্যাম্পেইনটি সফল করতে মোট ২ লাখ ৮০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পেইন পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমস্ত কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হবে বলে সরকার আশা ব্যক্ত করেছেন।

ভিটামিন ‘এ’ এর প্রধান কাজ দেহবৃদ্ধি এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে ভিটামিন ‘এ’ কাজ করে। ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের ম্যালেরিয়া, হাম এবং ডায়রিয়াজনিত জটিলতা কমিয়ে আনে। ডায়রিয়া হলে শিশুর দুর্বলতাসহ শরীরে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু ভিটামিন ‘এ’ ডায়রিয়ার ব্যাপ্তিকাল ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে এবং চোখের ছানি প্রতিরোধে ভিটামিন ‘এ’ এর ভূমিকা রয়েছে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ভিটামিন ‘এ’ দেহের ত্বককে রক্ষা করে। ভিটামিন ‘এ’ ব্রণ, একজিমা, ফোঁড়া এবং ক্ষত সারাতে কাজ করে।

ভিটামিন ‘এ’ এর অভাব পূরণে শিশুদের নিয়মিত ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ

মাছ-মাংস, ফল, শাক-সবজি খাওয়ানো দরকার। শাক-সবজি অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। শুধু পানি দিয়ে সিদ্ধ করলে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যাবে না। পরিবারের রান্নায় ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টির জন্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের।

- ২-

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ রঙিন শাক-সবজি এবং হলুদ ফলমূল খাওয়া উচিত। শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণমতো ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়াতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদানের অভাবে শিশুরা মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়ে থাকে ও প্রায়ই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু সরকারের লক্ষ্য হলো আগামী প্রজন্মকে সুস্থ-সবল ও নিরোগ দেহের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ কারণেই ক্যাম্পেইনে পুষ্টি-বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস। প্রতি ৬ মাস অন্তর সরকারের এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা গেলেও এটি অব্যাহত রাখতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সব ধরনের ভিটামিনযুক্ত খাবার থাকতে হবে।

(৪-১৭) অক্টোবর সকল কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। যদি কোনো শিশু গত চার মাসের মধ্যে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেয়ে থাকে তবে তাকে ক্যাম্পেইনে এ ক্যাপসুল খাওয়ানো যাবে না। ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল ভরাপেটে খাওয়ানো ভালো। এটি খাওয়ানো হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বমি, পেটের পীড়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে, তবে এটা সাময়িক। এ ধরনের সমস্যা হলে শিশু বুকের দুধ ও খাবার স্যালাইন খাবে, প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়াস অব্যাহত থাকুক। অন্ধত্বের হাত থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত থাকবে- এ প্রত্যাশা সবার।

হৃদয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী তৎকালীন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স এর ডিজিএফআই ঢাকার ডিটাসমেনট এর প্রধান এবং বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ আদালতে দেয়া সাক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের সন্ধ্যায় তিনি বঙ্গভবনে যান সেখানে রাষ্ট্রপতি রুমে বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খান বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার সামরিক সচিব কর্নেল জামিল ঘাতকদের সদস্যমেজর ডালিম মেজর শাহরিয়ার রশিদ মেজর ফারুক মেজর নূর মেজর মহিউদ্দিন মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত ছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা খুনি মোশতাক তাহের ঠাকুর মাহবুব আলমসহ অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত ছিল। দেশবাসী যা চাই সব ক্ষেত্রে তার প্রাপ্তি ঘটে না নইলে আব্রাহাম লিংকন ঘাতকদের হাতে প্রাণ দিবেন কেন? তার এমন মৃত্যু কি কেউ কামনা করেছিল? কেউ কি কামনা করেছিল গান্ধীজীর উন্মুক্ত বক্ষে বুলেটের আঘাত হবে ? মার্টিন লুথার কিং প্রাণহীন দেহ এমনি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে । চে গুয়েভারকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা। নেলসন ম্যান্ডেলাকে ফাঁসির মঞ্চথেকে ২৭ বছর কারাবরণ ।

ইন্দ্রাগান্ধীর বিশ্বস্ত বডিগার্ডদ্বারা গুলিবিদ্ধ হত্যা । রাজীব গান্ধী ফুলের বোমায় মৃত্যু বরণ। এমন গর্বিত অনেক ব্যক্তিরা অনাকাঙ্খিত হত্যা হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসে। তার মধ্যে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং পরিবারের মোট ১৮ জনকে হত্যা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই এদেশের সংগ্রাম শুরু এবং তার হাত ধরেই সংগ্রামের শেষ ঠিকানা স্বপ্নের বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সাল ২৬ মার্চ, স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান করে প্রথম সরকার গঠন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে জাতীয় চার নেতার সাহসী নেতৃত্বে নয়

মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ শহীদ ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে সেদিন আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছিলাম। মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ২৩ বছরের আন্দোলনে একটি স্বাধীন দেশ দিয়েছিলেন। তারপর বাঙালির অধীর অপেক্ষা যা মৃত্যুর চেয়েও কঠিন ছিল। কখন দেশে আসবে বাংলার রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু। তামাম বিশ্বের নেতারা এবং বিশ্ববাসী পৃথিবীর জন্য নতুন এক যোদ্ধা পেল । বিশ্ব রাজনীতিতে একদিকে প্রকৃত বন্ধু অন্যদিকে শত্রু হয়েছিল।

সব বাধা পেরিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের জিন্দানখানা মিনওয়ালী কারাগার থেকে লন্ডন এরপর দিল্লি তারপর কাঙ্খিত স্বপ্নের সেই স্বাধীন সোনার বাংলায় বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে ফিরে আসলেন । লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত ছিল বিমান বন্দরে তাদের প্রাণ প্রিয় নেতাকে দেখতে। সেদিন বিমান বন্দরে নেমে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ঠাকুর (রবি ঠাকুর) আমার জনগণ তোমার কথাকে ভুল প্রমাণিত করেছে। সাতকোটি বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের সেই মুহূর্তের আবেগ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কান্না জড়িত আবেগাপ্লুত কন্ঠে বলেছিলেন আমার জনগণ ছাড়া আমি বাঁচবো না।

৫২ বছর বয়সে রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করেন এরপর শুরু হলো দেশ গড়ার স্বপ্ন এবং সংগ্রাম অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছিল। যুদ্ধে ধ্বংস হয়েগিয়েছিল পুরো দেশ। সে সময় ২৯২টি রেলসেতু ছিল না। হাজার হাজার সড়ক সেতু যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের সাথে ইউনিয়ন ইউনিয়নের সাথে থানা, থানার সাথে মহকুমা, মহকুমার সাথে জেলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ব্যাংকে টাকা ছিলনা বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ছিল না গুদামে খাবার ছিল না । কর্ম ছিলনা নাজুক চিকিৎসা ব্যবস্থা এমনি একটা পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের দায়িত্ব নিলেন।

সারা বিশ্বের কাছে স্বীকৃতি চাইলেন দেশ গঠনে সহযোগিতার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে উদাত্ত আহবান জানালেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় চার মূলনীতি সংবিধানে সন্নিবেশিত করে ১৯৭২ সালের সংবিধান দিলেন যা ছিল একটি রেকর্ড এবং অবিশ্বাস্য । এত স্বল্প সময়ে পরিপূর্ণ একটি সংবিধান তৈরি করা সত্যিই দুঃসাধ্য ছিল তবুও তিনি সেটি করে দেখিয়েছেন এই সেই বঙ্গবন্ধু। সদ্যস্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষের ম্যান্ডেট গ্রহণের জন্য ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন দিয়েস্বাধীন বাংলাদেশের নবযাত্রা শুরু করলেন ।

কখনও রাষ্ট্রপতি কখনও প্রধানমন্ত্রী কখনও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু একটি সোনার বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন একাধিক বার রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন করে স্থায়ী পূর্ণ সমাধানে আসতে চেয়েছিলেন। কোনদিন তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেননা । বাঙালির অকৃত্রিম ভালবাসা আর বিশ্বাস নিয়েস্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার বাঙালির ঠিকানা ধানমন্ডির ৩২ নং এর নিজ বাড়িতেই থাকতেন। এই মানুষটার ছিল আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস এবং ভরসা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি ঐতিহাসিক ৭মার্চ ভাষণে বলেছিলেন“রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ”।

সেদিন যখন বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠছিলেন তখন তাঁর জীবনের সাথী প্রিয় ড্রাইভারটি বলেছিল আপনি জনসভায় যাচ্ছেন হাতে কাগজ পত্র কই? তখন বঙ্গবন্ধু উপরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন কি বলবো আল্লাহ জানে। আল্লাহ আমাকে দিয়ে যা বলাবে আমি তাই বলবো। একথায় বোঝা যায় আল্লাহর প্রতি কি অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা। বঙ্গবন্ধু জীবনে সব সেক্টরেই পদচারণা করেছেন। অনেক নেতাকে বলেছেন তোমরা শিশু হয়ে যাও। এত বিশাল হৃদয়ের মানুষটি ছিলেন শিশুর মত। তিনি শিশুর মত করেই হাসতেন।